ইউএসএআইডি এশিয়া কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসনস প্রকল্প

মানব পাচার রোধে সুরক্ষা বিষয়ক ব্রিফিং:

বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও তাইওয়ানে ভিকটিম সনাক্তকরণ বিষয়ক শিক্ষণ

রচনা-
এরিক কাসপার এবং মিনা চিয়াং

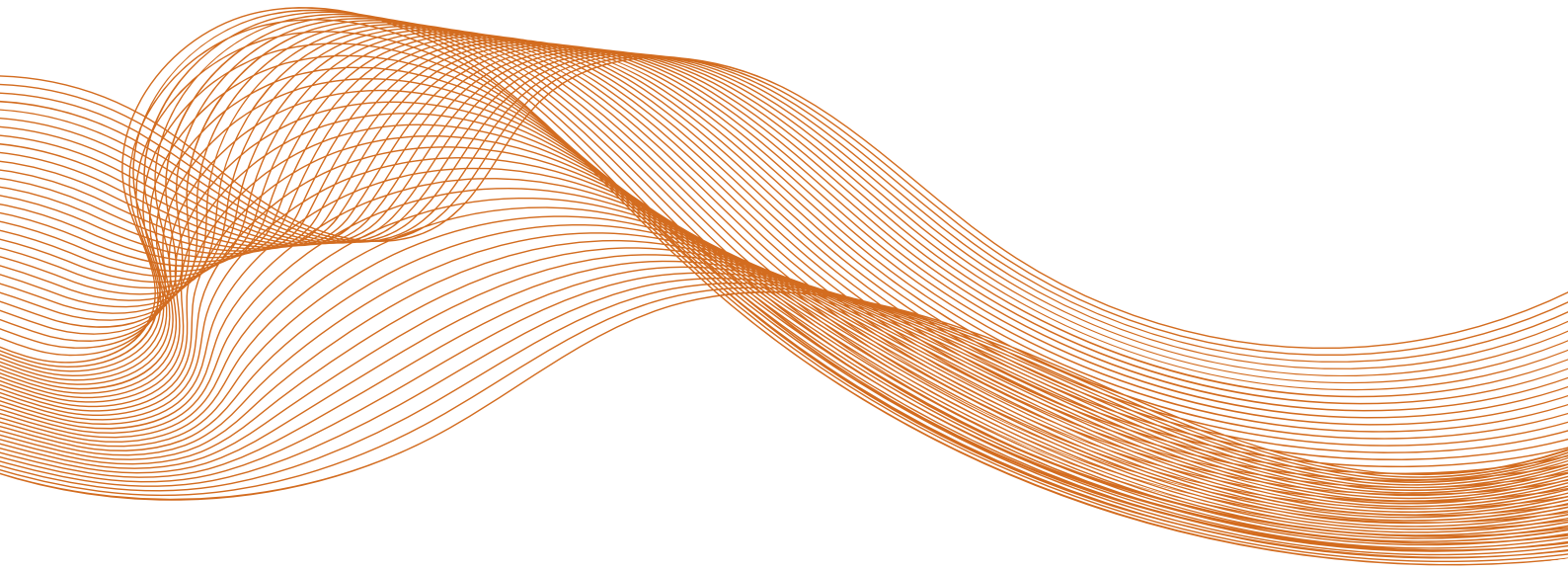

ইউএসএআইডি এশিয়া কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসনস প্রকল্প

এই ব্রিফিং-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো ২০২২ সালে এরিক কাসপার এবং মিনা চিয়াং কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত "BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR MORE EFFECTIVE IDENTIFICATION OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING: Insights from Bangladesh, Cambodia, and Taiwan" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন (DOI: 10.19088/IDS.2022.033) থেকে নেয়া হয়েছে। মানব পাচার রোধে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা মাথায় রেখে ভাষার মিতব্যয়ীতা ও সহজবোধ্যতা নিশ্চিত করে এই ব্রিফিংটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

কপিরাইট ©২০২৪ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বব্যাপী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত সম্মুখ সারির একটি সংস্থা যা পৃথিবীর জটিলতম সামাজিক, কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক সংকটগুলোর সমাধানে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠাতা উইনথ্রপ রকোফেলার কর্তৃক অনুপ্রাণিত উইনরক ইন্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

তথ্যসূত্রের স্বীকৃতি দেয়া সাপেক্ষে এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ধৃতি ও পুনরুৎপাদনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলো। তবে পুণঃবিক্রয় বা অন্য কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনার কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (USAID) এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগনের উদার সহযোগিতায় এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু কোনভাবেই ইউএসএআইডি অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।

ভূমিকা

সমস্যার রূপরেখা:

- মানবপাচারের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদেরকে সুরক্ষা ও সারভাইভারদেরকে সহায়তা দেয়া এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবপাচার কমানোর পদক্ষেপ চলমান থাকা সত্ত্বেও এটি অন্যতম বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

- বেশিরভাগ ভিকটিমকেই সনাক্তকরণ সম্ভব হয় না বিধায় তারা কোন রকম সহায়তা বলয়ের বাইরে থেকে যান। মানবপাচারের প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হবার পরও তারা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

- ভিকটিমদের সবাইকে সনাক্তকরণ সম্ভব না হওয়ায় 'মানবপাচারের ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটে' তা পুরোপুরিভাবে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে, যা বিশ্বব্যাপী মানবপাচার রোধ বিষয়ক কার্যক্রমকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। মানবপাচার বিলুপ্ত করতে হলে আমাদেরকে আরো কার্যকর উপায়ে ভিকটিমদেরকে সনাক্ত করতে হবে।

মানবপাচারের ভিকটিমদের একটি বিশাল অংশ প্রতিবছর সনাক্ত হওয়া ছাড়াই থেকে যান। ধারনা করা হয়, বিশ্বে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ বর্তমানে আধুনিক দাসত্বের অবস্থায় রয়েছেন (আইএলও, ২০২২)। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টর ২০২৩ সালের ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্টে এক লক্ষ ১৫ হাজারেরও কম ভিকটিমকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে- উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজারের কিছু বেশি মানুষ বিচার পেয়েছেন।

এই প্রকাশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মানবপাচারের ভিকটিম এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে- কীভাবে সফল সনাক্তকরণ সম্ভব হতে পারে- তা জেনে নিয়ে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বাধাগুলোকে আরো ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করা।

- মানবপাচারের ভিকটিমদেরকে কীভাবে আরো কার্যকর এবং দ্রুত উপায়ে সনাক্তকরণ সম্ভব- তা খুঁজে বের করা।

- মূল গবেষণা প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ উপস্থাপন করা; যা এখানে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে।

গবেষণাটির ক্ষেত্র এবং পদ্ধতি:

- মানব পাচার রোধে নিয়োজিত সম্মুখসারির কর্মী ও ভিকটিমদের সাথে আমরা নিবিড় সাক্ষাৎকার (in-depth interview) সম্পন্ন করেছি। সাক্ষাৎকারগুলো সম্পন্ন করতে আমরা গবেষক ও এনজিওদের সাথে চলমান গবেষণা বিষয়ক একটি অংশীদারিত্বের সদ্ব্যবহার করেছি।

- সনাক্তকরণ কীভাবে এবং কেন ঘটে তা বুঝতে আমরা এ বিষয়ক সফল কেসগুলোকে বিশ্লেষণ করেছি যেনো আমরা- সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারে- এমন সৃষ্টিশীল ও অভিনব কৌশলগুলো জানতে পারি।

গবেষণার মুখ্য ফলাফলসমূহ:

- ভিকটিমরা পাচারের অবস্থা থেকে বের হওয়া বা সাহায্য পেতে তাদের পরিবারের সাথেই প্রধানত সর্বপ্রথম যোগাযোগ করে থাকে। পরিবারগুলো এরপর এনজিও বা সরাসরি সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তাদের উদ্ধারে সচেষ্ট হয়।

- সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এটি স্বীকার করতে হবে, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একা/আলাদা থাকা ভিকটিমদের জন্য প্রায়শই যোগাযোগের প্রধান উপায় হতে পারে।

- আমরা যেসব ভিকটিমের সাথে কথা বলেছি তারা বেশিরভাগ সময়ে সাহায্যের আশায় অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলোর দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলো তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এমন গল্পও আমরা শুনেছি যেখানে প্রতিবেশী বা দালালরা অন্য পাচারকারীদের কাছে ভিকটিমকে বিক্রি করে দিয়ে তাদের অবস্থার সুবিধা নিয়েছে।

- সনাক্তকরণের বিপজ্জনক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পথগুলোকে অনুৎসাহিত করতে আরো ভালো বিকল্প ব্যবস্থাগুলোকে সেখানে গড়ে তুলতে হবে। যেমন, এটি অভিবাসীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে- সাহায্য পেতে ভিকটিমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা, সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পুলিশ ইউনিটগুলো ও কনস্যুলার অফিসগুলোকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে।

- কর্তৃপক্ষ ভিকটিমদের যোগাযোগ করতে সুবিধা হয় এমন বাড়তি কিছু সম্ভাব্য যোগাযোগের স্থান তৈরি করতে পারে; যেমন, শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে ভিসা নবায়ন করার সময় বা যেসব স্থানে সাধারণত নারীরা জোরপূর্বক বিবাহের শিকার হন সে জায়গায়গুলোতে প্রয়োজনীয় শারীরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা আয়োজন করার মাধ্যমে।

- কখনো কখনো স্পেশাল টাস্কফোর্স ও বিশেষ কমিটি গঠন করেও ভিকটিমদের সনাক্তকরণ ত্বরান্বিত করা যায়। এসব টাস্কফোর্স বা কমিটি গুলোকে ভিকটিমদেরকে খুঁজে পেতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করা হয় এবং ভিকটিমরাও এসব কমিটি এবং টাস্কফোর্সগুলো বিশ্বাসযোগ্য হবে- এমন ধারনা পেয়ে যায়।

- ভিকটিম সনাক্তকরণে বাধা-বিপত্তিগুলো ভিকটিমদের অসহযোগিতা বা কর্তৃপক্ষের অলসতার কারনে ঘটে না। বরং ভিকটিম সনাক্তকরণ পদ্ধতির মূলে গেঁথে থাকা বৈষম্য ও শোষনের মানসিকতা থাকার কারনে এসব বাধা-বিপত্তি ঘটে থাকে।

- সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। একইভাবে এমনটা ভাবাও ঠিক নয়, যে কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোই সনাক্ত করবে। বরং, এটিকে ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ- একে অপরের সাথে সক্রিয় ও উৎপ্রোতভাবে জড়িত একটি চলমান প্রক্রিয়া (ডেলিকেট ডান্স) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যেখানে ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ- উভয়কেই অবশ্যই একইসাথে সক্রিয় থেকে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

- প্রায়শই প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কাজের প্রক্রিয়া সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও আচরণগত বাধাগুলোর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আইন ও নীতিগুলোকে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যেনো সেগুলো ভিকটিমকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়। এসব আইন ও নীতি কীভাবে প্রয়োগ করলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কাজের প্রক্রিয়ায় বাস্তব পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে- তা আমাদের জানতে হবে।

ভুক্তভোগী সনাক্তকরণ কী?

যে মূল দলিল থেকে মানব পাচার ধারনাটির সংজ্ঞা নেয়া হয়েছে তা জাতিসংঘের মানবপাচার বিষয়ক প্রোটোকল হিসেবে পরিচিত, যার সম্পুর্ণ নাম হলো "মানবপাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তিপ্রদান বিষয়ক প্রটোকল "।

> **জাতিসংঘের মানব পাচার বিষয়ক প্রোটোকল: অনুচ্ছেদ ৩ ধারা (ক)**
> "মানব পাচার" অর্থ শোষণের উদ্দেশ্যে হুমকি বা বলপ্রয়োগ বা অন্যকোন জবরদস্তিমূলক উপায়ে বাধ্য করার মাধ্যমে, অথবা অপহরণ বা প্রতারণা, কিংবা ছলচাতুরি, বা ক্ষমতার অপব্যবহার, বা কারো বিপন্ন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ, বা অপর এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তির সম্মতি আদায়ের জন্য অর্থ বা সুবিধা লেনদেনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয় দান বিংবা গ্রহণ করা। শোষণ বলতে, ন্যূনতম অর্থে, অপরকে যৌনকর্মে নিযুক্ত করা, বা অন্যান্য ধরনের যৌন শোষণ, বলপূর্বক শ্রম বা সেবাদানে বাধ্য করা, দাসপ্রথা বা অনুরূপ ব্যবস্থা, শ্রমদাসত্ব বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণও বোঝায়।

এ সংজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় আইনে মানবপাচারের সংজ্ঞা অস্পষ্ট এবং মানবপাচার সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের ধারনাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক মানুষই মানবপাচারের কথা চিন্তা করতে গেলে চূড়ান্তমাত্রার নীপিড়নকে কল্পনা করেন, যেমন: জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ। এটি কর্তৃপক্ষ ও ভিকটিম, উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বল্পমাত্রার নীপিড়নগুলোকে মানবপাচারের ঘটনা হিসাবে সনাক্তকরণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন এলাকায় জেলেরা অধিক সময় ধরে কাজ করেন, নিগ্রহের শিকার হন এবং তাদের পারিশ্রমিকও নায্য নয়- এমন ঘটনাও যে মানবপাচার হিসাবে সনাক্ত হতে পারে, কতৃপক্ষ তা ধারনা করতে পারে না। মানবপাচারের সংজ্ঞা বোঝার ক্ষেত্রে এই বহুবিস্তৃত ভুল ধারণা কার্যকর সনাক্তকরণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

ভিকটিম সনাক্তকরণের সংজ্ঞা:

জাতিসংঘের মানবপাচার বিষয়ক প্রোটোকল মানবপাচার ধারণাটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেও প্রটোকলটি পাচারের 'ভিকটিম সনাক্তকরণ' প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে না। একইসাথে এই পরিভাষাটির সংজ্ঞায়নও দূর্বল। সাধারণ জনগণ এবং পেশাদারদের কাছে যখন এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন সচারচর এটিকে একটি 'উপরের সারিতে বসা কর্তৃপক্ষ কতৃক নিচের দিকে থাকা ভিকটিমদের সনাক্তকরণ (টপ-ডাউন) পন্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, এবং ধরে নেয়া হয় শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের তৎপরতার মাধ্যমে সনাক্তকরণ ঘটে। থাকে। এটি তখন হয়, যখন:

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ভিকটিমকে খুঁজে বের করে
- সরকারী কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে সারভাইভারদের সহায়তা প্রদান করা শুরু করে
- সরকার পক্ষগুলো জাতীয় পরিসংখ্যানে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিকটিমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে
- বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) গুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে সারভাইভারদের সেবা প্রদান করা শুরু করে

ভিন্নভাবে দেখতে গেলে, ভিকটিম সনাক্তকরণ বলতে বোঝানো যায় নিজেকে সনাক্তকরণ। ভিকটিম নিজেকে সনাক্ত করার এই 'বটম-আপ' পন্থাটি তখন ঘটে যখন ভিকটিমরা নিজেদের ভুক্তভোগী অবস্থাকে তাদের পরিচয়ের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নেয়। এটি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও, সনাক্তকরণের এই 'বটম-আপ' প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে মানবপাচারের বৃহত্তর পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে না; বা কর্তৃপক্ষের জায়গা থেকে ভিকটিমদের জন্য সহযোগিতা আদায়ের কোনো পথও এটি তৈরি করে না।

সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

ভিকটিমকে অবশ্যই:	**কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই:**
মানবপাচারের ধারণা বুঝতে হবে, এবং বুঝতে হবে যে, পাচারের শিকার হওয়া মানুষদের জন্য আইন রয়েছে	
বুঝতে হবে তারা একটি শোষণের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন, এবং এতে পাচারের ঘটনা ঘটেছে	বুঝতে হবে যে তাদের আশেপাশেই পাচারের ঘটনা ঘটতে পারে এবং হতে পারে তাদের সাথে ইতোমধ্যেই ভিকটিমদের দেখা হয়েছে
জানতে হবে যে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলে আইনগতভাবে তাদের নির্দিষ্ট কিছু সহায়তা ও সেবা-উপকরণ পাওয়ার কথা	জানতে হবে এই আইনগুলো পাচারের শিকার ব্যক্তিদেরকে সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে তাদেরকে কিছু দায়িত্ব এবং অনুমোদন প্রদান করে
জানতে হবে যে ভিকটিম হিসেবে সনাক্তরকণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে	বুঝতে হবে যে, যদিও তারা পাচারের ভিকটিমদেরকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট, তা সত্ত্বেও ভিকটিমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করতে পারে
মনস্থির করতে হবে যে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসা এবং সহায়তা গ্রহণ করা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে	বুঝতে হবে যে ভিকটিমের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে
সফলভাবে সনাক্ত হওয়ার পথগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে	ভিকটিমদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সনাক্ত করতে এবং সনাক্তকরণ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে তাদের সাথে দেখা হলে কী কী করণীয়- তা বুঝতে হবে

আমাদের ধারণাগত কাঠামোঃ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে উভমূখী বাঁধাগুলোকে পিরামিড আকারে দেখা

আমরা দাবি করছি যে কার্যকরভাবে ভিকটিমদেরকে সনাক্ত করতে ভিকটিম এবং কর্তৃপক্ষ- উভয়কেই অবশ্যই পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে ভিকটিমের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেখাতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাস্তবে এর অর্থ হবে- ভিকটিম কোনো সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যেকোনো ধরণের সহযোগিতা বা সেবা পাওয়া শুরু করবে। এক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র/অথবা এনজিও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হতে পারে। বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ায় সনাক্ত হয়ে ইতোমধ্যে নিজেদের দেশে ফিরে গেছেন এমন ভিকটিমদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা বেশিরভাগ সময় এনজিওগুলোর দ্বারা সনাক্ত হয়েছেন বা সেবা পেয়েছেন।

কিন্তু, এসব ক্ষেত্রে ভিকটিমদের রাষ্ট্রীয় সহায়তা, যেমন, ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি পাওয়ার সুযোগ ছিলনা। ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ, উভয়ে তাদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের যে বিস্তৃত উভমূখী বাঁধাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন তা মূলত পাঁচটি ধাপের পিরামিড আকারে উপস্থাপন করা যায়:

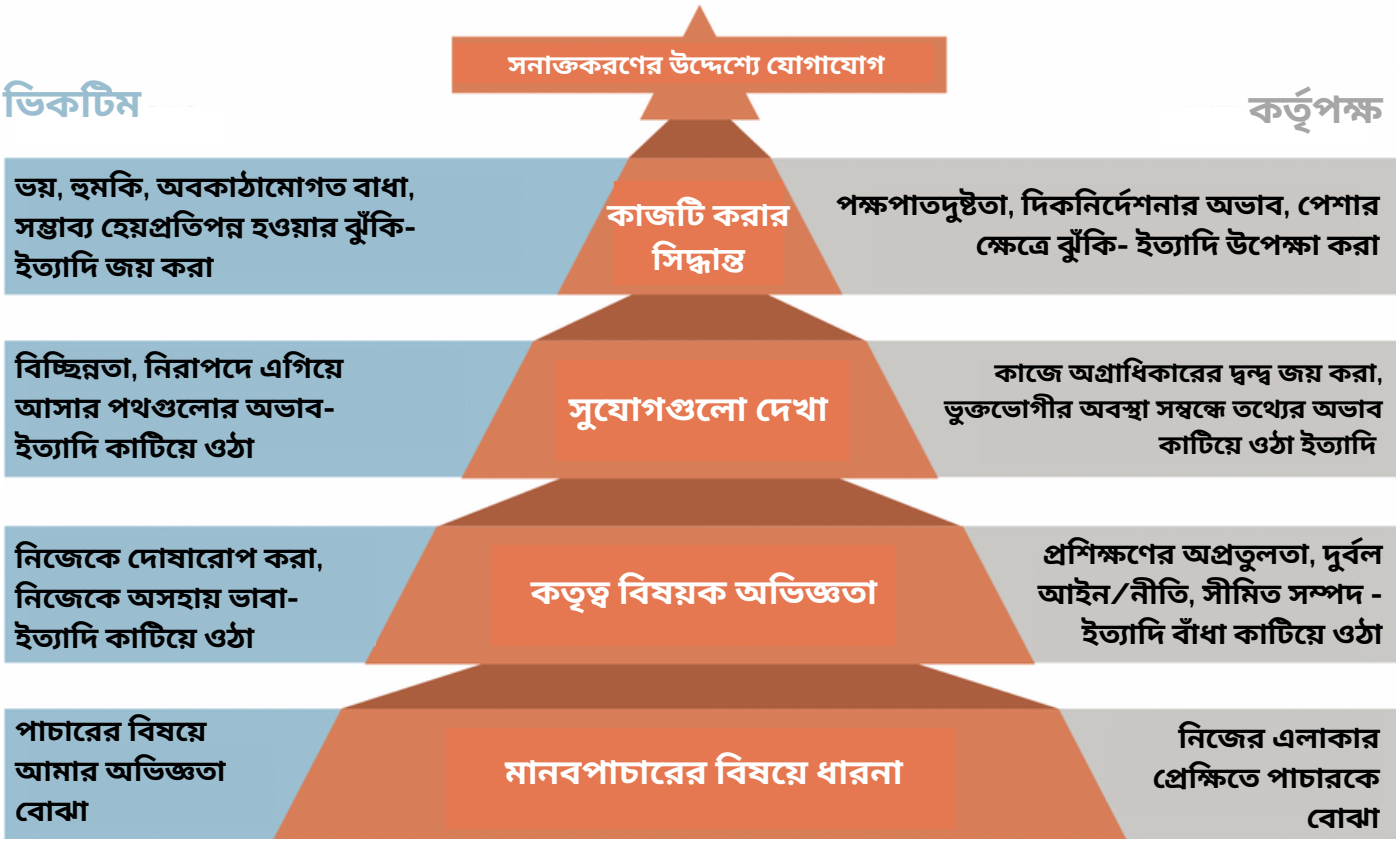

চিত্র ১: মানবপাচারের সারভাইভারদের সনাক্তকরণে উভমূখী বাধাগুলোর পিরামিড।

ভিকটিমকে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ:

মানবপাচার বিষয়ে বোঝাপড়া

ভুক্তভোগী	কর্তৃপক্ষ
"আমি জানতাম না আমাদের দেশে মানবপাচারের ঘটনা কিভাবে ঘটে। বিদেশ থেকে ফেরত আসা এবং সচেতন (সারভাইভারদেরকে সেবা প্রদানকারী একটি এনজিও) থেকে বিভিন্ন সেবা ও প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করার পর আমি বুঝতে পারি যে আমিও মানবপাচারের একজন ভিকটিম" – বাংলাদেশি সারভাইভার।	**"বিগত বছরগুলিতে আমরা অন্যতম যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি তা হল মানবপাচারের বিদ্যমান স্বরূপের পরিবর্তন। ঘটনাগুলো আগের তুলনায় অনেক সূক্ষ হয়েছে। যত্নশীল উপায়ে তদন্ত করা ও ভিকটিমদের অসহায়ত্বের বিভিন্ন দিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে না পারলে পাচারের ভিকটিমদেরকে সনাক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন" – তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ**
আমরা সারভাইভারদের মাঝে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করেছি- আসলে কী কী ঘটলে তা পাচারের ঘটনা হয়- এ বিষয়ে তাদের মাঝে অনেক ভুল ধারনা রয়েছে। অনেক জনগোষ্ঠীর মাঝেই এই ধারনা থাকে যে জীবনধারণের জন্য তাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে হবে। ভিকটিমরা উদ্ধার হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পরও তাদের মাঝে বোঝাপড়ার ঘাটতি থেকে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে দুর্ঘটনায় পরার আগের অবস্থায় তাদের মাঝে যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা বেপরোয়া পরিস্থিতিতে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে খুব কম কাজ করেছে। উল্টোভাবে আমরা আমাদের গবেষণায় দেখেছি যে, ঘটনা ঘটার পর সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ভিকটিমকে তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর সনাক্ত করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে। এটি ভিকটিমের মাঝে ও তার কমিউনিটিতে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া/করা এবং মানবপাচার বিষয়ক ভুল ধারনাগুলোকে প্রতিহত করতেও সাহায্য করে।	পুলিশ, সরকারী কর্মকর্তাগণ ও সম্মুখসারির কর্তৃপক্ষগুলো পাচারের প্রকৃতি এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে তা কীভাবে প্রকাশ পায় তা অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যার ফলে তাদের সাথে ভিকটিমদের সাক্ষাৎ ঘটলেও ভিকটিমদেরকে যথাযথভাবে সনাক্ত করতে না পারার আশঙ্কা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আমাদের গবেষণায় দেখেছি, যে মানবপাচারের নারী ভিকটিমরা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতায় যোগাযোগ করেন; যে জটিলতাগুলো প্রায়শই জোরপূর্বক গর্ভপাতের ফলে ঘটে থাকে। প্রায়শই স্বাস্থ্যখাতের পেশাজীবীরা একমাত্র সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠেন যাদের ভিকটিমদের সাথে দেখা হয় এবং ভিকটিমদেরকে সহায়তা করার সুযোগ থাকে। কিন্তু আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীদের কেউই ভিকটিমদেরকে সহায়তা করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেন নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়নি যে তারা বুঝতে পেরেছেন যে তারা পাচারের ভিকটিমকে চিকিৎসা দিচ্ছেন, বা তারা ভিকটিমদেরকে সেবা দেয়ার জন্য কোন প্রশিক্ষন পেয়েছেন।

কতৃত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা

ভিকটিম	কর্তৃপক্ষ
"আমি যখন ফিরে আসি, আমার কোনোকিছু সম্পর্কেই কোনো ধারণা ছিল না। আমার পাশের এলাকাতেই আরেকজন ভিকটিম ছিল। আমার ভাই আমাকে জানিয়েছিল যে, সেই ভিকটিমটি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এরপর আমি সেই ভিকটিমকে খুঁজতে থাকি এবং এবং তার মাধ্যমেই আমি "সচেতন" (সারভাইভারদের সেবা প্রদানকারী সংস্থা) এর সম্পর্কে জানতে পারি" – বাংলাদেশি সারভাইভার	**"মানবপাচার যেকোনো সাধারণ অপরাধের ঘটনার চাইতে অনেক বেশি জটিল। তাইওয়ানে মানবপাচারের সংজ্ঞাটি বেশ দীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। আইনটিতে এ নিয়ে বিস্তারিত কোনোকিছু বলা নেই। একমাত্র অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসাররা সঠিক তথ্যপ্রমান হাজির করার মাধ্যমে ভিকটিমের অসহায়ত্বের অবস্থা প্রমাণ করতে পারেন" – তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ**
মানবপাচারের ভিকটিমরা নিজেদেরকে ভিকটিম হিসেবে বিবেচনা নাও করতে পারেন। তারা সাধারণত এটুকু বুঝতে পারেন যে তারা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারা নিপীড়নটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারেন না এবং তাদের এই অভিজ্ঞতার কোনো নাম দিতে পারেন না। ফলে তারা সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিতে পারেন না। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, ভিকটিমরা প্রায়শই স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর হয়ে থাকেন, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত এবং চাকুরিতে নিয়োগের প্রক্রিয়াটি বুঝেন না। ফলে তারা দালালের কাছে নিরুপায় হয়ে পড়েন, এবং দালাল তাদেরকে শোষণ করে। এমনকি, ভিকটিমরা নিজেদেরকে দোষী বা অপরাধী হিসেবে ভাবতে পারেন, বিশেষত যখন পাচারের প্রক্রিয়াতে কোথাও তাদেরকে আইন অমান্য করতে হয়। সর্বোপরি ভিকটিমদের মাঝে নিয়ম-কানুন এবং কর্তৃপক্ষের উপর আস্থার অভাব থাকতে পারে। এমনকি তারা যে ভিকটিম, এবিষয়ে তারা সচেতন থাকার পরও তাদেরকে সুরক্ষা দিতে আসা কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের অনাস্থার কারণে ভিকটিমদের সহায়তা চাওয়ার আগ্রহ চাপা পড়ে যেতে পারে।	সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের বাঁধা এবং জটিলতার ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাগণ প্রায়শই ভিকটিমের নিজে থেকে এগিয়ে আসার আগ পর্যন্ত কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা অনুভব করেন। এমনকি কর্তৃপক্ষ মানবপাচারের বিষয়ে অবগত থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সহায়তা করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ না থাকা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন -কানুনের অভাব, এবং পর্যাপ্ত অর্থ ও মানবসম্পদের অভাবে ভোগেন। সরকারি সংস্থাগুলো কোন ঘটনায় ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব কার- সে বিষয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগতে পারে। সীমান্তরক্ষী বাহিনি বা শ্রম পরিদর্শকদের মত সম্মুখসারির অফিসারদের প্রায়শই সুযোগ থাকে ভিকটিমদের সাথে যোগাযোগ করার, কিন্তু মানবপাচারের ভিকটিমদেরকে সনাক্তকরণে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হন না। ভিকটিমদের সাথে দেখা হলে কী কী দায়িত্ব পালন করবেন এবং কী কী দায়িত্ব পালন করবেন না- তা নিয়েও কর্তৃপক্ষগুলো বিভ্রান্তিতে ভোগে এবং প্রায়শই ভিকটিমদেরকে ভূল করে অপরাধী বা অবৈধ অভিবাসনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সুযোগগুলো দেখা

"আমি মনে করি আমাদের সরকার ভুক্তভোগীদেরকে সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখে না যতটা গুরুত্ব এনজিওগুলো দেয়... আমি সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম এবং প্রায় এক মাস যাবত আমি চেষ্টা করেছিলাম সরকারি সাহায্য পেতে, কিন্তু কোনো খবর পাইনি " – একজন বাংলাদেশি সারভাইভার ও সম্মুখসারির কর্মী।

ভিকটিম	কর্তৃপক্ষ
যেসব ভিকটিম এখনো পাচারের প্রক্রিয়ার ভেতরে আবদ্ধ, তারা হয়তো তা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না অথবা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। ভিকটিমরা এ বিষয়েও চিন্তা করতে পারেন যে তাদেরকে সনাক্ত করা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভবিষ্যতে গন্তব্য দেশে তাদের কাজের (কাজটি অবৈধভাবে হলেও) সুযোগ নষ্ট হবে। নিজ দেশে কর্মসংস্থানের সুবিধা না পেয়ে গুরুতর অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পেতে অনেক ভুক্তভোগীই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে পাচারের অভিজ্ঞতা ভোগ করেন। তারা হয়ত ভালোভাবেই জানেন প্রত্যাবর্তনের পর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে হতাশাজনক পরিস্থিতি, যার সম্ভাব্য বিস্তৃতি বেকারত্ব থেকে শুরু করে জেল-জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কিছু সারভাইভার এমন কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা তাদের মানবপাচারের ভিকটিম হিসেবে বিবেচনা করার পূর্বেই জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল।	মাঝেমাঝে কর্তৃপক্ষেরও কিছু বাধা অতিক্রমের প্রয়োজন রয়েছে, যেমন, কোন কাজ আগে এবং কোনটি পরে করা হবে, কাজের ক্ষেত্রে এমন অগ্রাধিকার-বিষয়ক দ্বন্দ, সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের অভাব, ঘটনা জানা বা ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে ভিকটিমদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকা এবং ভিকটিমদের সাথে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ যোগাযোগ স্থাপনের অক্ষমতা। হাসপাতালগুলোতে পাচারের ভিকটিমদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ থাকে, কিন্তু হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের অন্যান্য 'গুরুত্বপূর্ণ' দায়িত্ব থাকে বা পর্যাপ্ত জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকে। এমনকি স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাজীবীরা একজন রোগীকে পাচারের ভিকটিম হিসেবে সনাক্ত করার পরেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা ছাড়া তারা সেই ভিকটিমের নিরাপত্তা বা অন্যান্য সুরক্ষা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে পারেন না। পুলিশেরও প্রায়শই বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের অগ্রাধিকার থাকে, যেমন, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা। মানবপাচারের ভিকটিমরা এক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক আচরণের শিকার হন। স্পষ্টতই সরকারী পক্ষগুলো কখনোই অভিন্ন ও একই ধরনের ব্যবস্থা নেয় না এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা মানবপাচারের বিষয়গুলোর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ প্রদর্শণ করে থাকে, যা ভিকটিম সনাক্তকরণের সুযোগকে আরো সীমিত করে দেয়।

মূল কাজটি করার সিদ্ধান্ত

"সরকার চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি। আমাদের গ্রামের নেতারা সুপারিশ করলেই কেবল সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়। সুপারিশ ব্যতীত সরকারি সহায়তা পাওয়া যায় না। আমার জন্য সুপারিশ করার কেউ ছিল না।" – বাংলাদেশি সারভাইভার

ভিকটিম	কর্তৃপক্ষ
ভিকটিমরা নিপীড়নের প্রক্রিয়ায় থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে, অথবা নিপীড়নের অবস্থা থেকে বের হয়ে অথবা ভিকটিম হিসেবে গণ্য হতে স্বেচ্ছায় কর্তৃপক্ষের সাথে একত্রে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জায়গা থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপটি নিতে পারেন। ভিকটিমরা আমাদেরকে জানিয়েছেন, পূর্বে তারা যখনই গন্তব্য দেশে নিজ দেশের দূতাবাসের সাথে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের সেই প্রচেষ্টাগুলো মূলত শারীরিক আঘাতপ্রাপ্তির মাধ্যমেই শেষ হয়েছে। তাদের নিজেদের দেশে পুলিশ সাধারণত ভিকটিমদেরকে সনাক্ত করার বদলে ভিকটিমদেরকে মানবপাচারের মামলায় সাক্ষ্য হিসেবে নিতেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের প্রতি অনাস্থা, আইনি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ও অনিশ্চয়তা - পুলিশের দ্বারা ভিকটিমদের সনাক্ত হবার আগ্রহকে বিনষ্ট করে দেয়। মানবপাচারের ভিকটিমরা ঘৃণার শিকার ও সামাজিক ভাবে হেয়প্রতিপন্নও হয়ে থাকেন, যা তাদেরকে সনাক্ত হতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করতে অনুৎসাহিত করে। বাংলাদেশের একজন পুরুষ সারভাইভার উল্লেখ করেছেনঃ "যখনই একজন নারী বিদেশ হতে ফেরত আসেন, সমাজ তাকে ঘৃণা করে। অনেক চেষ্টা করার পর সমাজ সেসব নারী ভিকটিমকে গ্রহণ করে।"	কর্তৃপক্ষকে সনাক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মানবপাচারের ভিকটিমদেরকে সনাক্ত করার কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য হলেও এটি একটি ফলপ্রসু কাজ। তারা এমনটা মনে করতে পারে যে সনাক্তকরণ পদক্ষেপ নেয়ার মত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়, কারণ, হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভিকটিমের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই বাজে ধারণা পোষণ করে রেখেছে, বা এমন মনে করতে পারে যে ভিকটিমকে সেবা-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করলেই সে কাঙ্খিত সহায়তা পাবে না, অথবা সনাক্ত করার কাজটি সাংগঠনিক দায়-দায়িত্বের বাইরের কাজ হওয়ায় জবাবদিহিতার ভয় থাকতে পারে, বা এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভিন্ন নির্দেশনা থাকতে পারে। এমনকি যদি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিতেও চায়, ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা এবং সেবার জন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে রেফার করার ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হবে- এসব বিষয়ে তাদের পরিষ্কার ধারণা নাও থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একজন ভিকটিমকে কিভাবে সনাক্ত করবে- এ বিষয়ে কোনো নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান নেই। তাইওয়ানে একটি প্রক্রিয়া থাকলেও একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছেন **"তাইওয়ানে একটি মানবপাচার প্রতিরোধ আইন রয়েছে। কিন্তু মানবপাচারের প্রতিটি উপাদানকে সেই আইনের আওতায় আনা সম্ভব নয়, ফলে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ থেকে যায়"**

সফলভাবে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আগত বাধাগুলি অনেকগুলো স্তরে ঘটতে পারে, এবং সেগুলো অতিক্রম করা অনেক কঠিন হতে পারে। সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সকল স্তরে উভয়পক্ষকে (ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ) সফল হতে হবে। ভিকটিমরা সনাক্তকরণের বিভিন্ন স্তরে যে বাধাগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকেন সেগুলো বিশ্লেষণ করা- ভিকটিমরা কেন এ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসতে অনাগ্রহী তা বুঝতে সাহায্য করে। ভিকটিম সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর ও স্বাভাবিক করতে এই বাধাগুলো অতিক্রমের বিভিন্ন পথ ও কৌশল তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে।

ভুক্তভোগী সনাক্তকরণের "ডেলিকেট ডান্স" মডেল

মানবপাচারের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, ভিকটিমদেরকে সনাক্ত করা ও সহায়তা দিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা- ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে খুব কম ভিকটিমই সফলভাবে সনাক্ত হয়। বিশাল সংখ্যক ভিকটিম সনাক্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বাধাগুলোর কারণে সনাক্তকরন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে যায়।

চিত্র: ২- এ সনাক্তকরণের পদ্ধতিগত বাধাগুলো অতিক্রম করার পথ দেখানো হয়েছে। এখানে যে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো- সনাক্তকরণ তখনই সফলভাবে সম্পন্ন হবে যখন ভিকটিম এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ- উভয়েই অবকাঠামোগত, আচরণগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারবে এবং একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।

এই বাধাগুলোকে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার ধারণাকে নতুনভাবে তৈরি করেছি। এই পুনর্গঠিত ধারণাটি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার কর্তৃপক্ষ-কেন্দ্রীক "টপ-ডাউন" দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে গিয়ে সনাক্তকরণকে একটি নতুন ছকে ফেলেছে, যেখানে এটিকে ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি "ডেলিকেট ডান্স" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

এই গবেষণায় সফল সনাক্তকরণের উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা ভিকটিমদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু সুনির্দিষ্ট সৃষ্টিশীল ও অভিনব উপায় বের করেছি, যেগুলো সাধারণত সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষগুলো আমলে নেয় না।

ভিকটিম সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে নতুন এই পদ্ধতিটি কীভাবে বিদ্যমান সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে- তা পরিষ্কারভাবে দেখাবে, এবং একইসাথে সফল সনাক্তকরণের নতুন পথ উন্মোচন করবে।

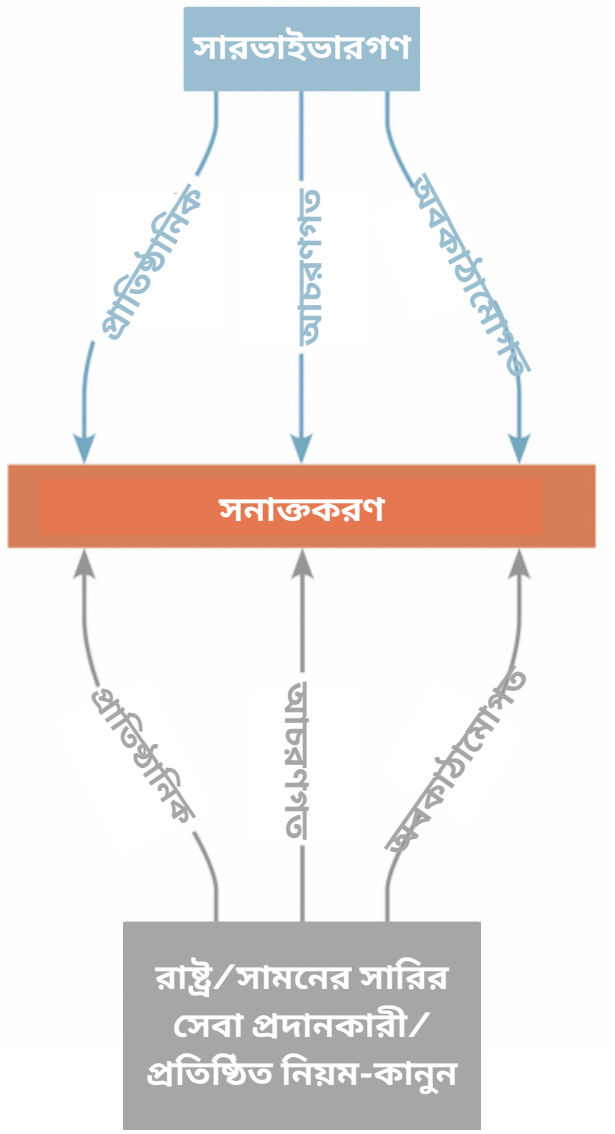

চিত্র ২। সনাক্তকরণের পদ্ধতিগত উপায়।

ধরণ	অবকাঠামোগত	আচরণগত	প্রাতিষ্ঠানিক
আমরা যা বোঝাতে চাই	ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষ যে অবকাঠামোগত পরিবেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে	ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতি ও আন্তঃগোষ্ঠীয় সম্পর্ক যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তার প্রক্রিয়া ও আচরণ কে প্রভাবিত করে	রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো

শারীরিক/অবকাঠামোগত বাধাসমূহঃ

ভুক্তভোগীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসেন।

যোগাযোগের কোন উপায় খুঁজে পাওয়ার পর আমরা দেখেছি যে ভিকটিমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সর্বপ্রথম পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে। স্মার্টফোন এখন খুবই বহুল-ব্যবহৃত উপায়। অন্যদিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর খরচ বাঁচায় এবং এতে সরাসরি রেকর্ডও করা যায়। পাশাপাশি আচরণগত বিষয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যোগাযোগ করা ও কতৃপক্ষকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এগুলো শনাক্তকরণের অবকাঠামোগত বাধাগুলোকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

"আমার মা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। অনেক বেশি সময় লাগায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আমি নিজের ভিডিও ফুটেজ নিতে শুরু করি এবং ফেসবুকে পোস্ট করা শুরু করি। ভিডিওটি ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়। কম্বোডিয়ার দূতাবাস আমার ঘটনাটির ব্যাপারে জানতে পারে এবং তিনদিন পর তারা আসে" – কম্বোডিয় সারভাইভার

"আমাকে বলা হয়েছিল পুলিশ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না... আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিই " – কম্বোডিয়ার সারভাইভার

কর্তৃপক্ষ সারভাইভারদের সাহায্য করতে দুরত্ব-জনিত বাধা অতিক্রম করেছে। আমরা বাংলাদেশি জেলেদের সাথে কথা বলেছি যাদেরকে মাছ ধরার ট্রলারে পাচার করা হয়েছিল। তারা কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক সনাক্ত হয়েছিলেন, যারা সমুদ্রে মানবপাচার সহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে নিয়োজিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ভিকটিমদেরকে খুঁজে পাওয়া, উদ্ধার করা, এবং সনাক্ত করা এটি প্রতীয়মান করে যে ভিকটিমদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে সৃষ্ট বাধা উপেক্ষা করে সনাক্ত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে কার্যকরভাবে এবং দ্রুতগতিতে সম্ভাব্য ভিকটিমদের জন্য তল্লাশি চালানো।

ভুক্তভোগীরা বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে যোগাযোগের উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত আস্থা না থাকা সত্ত্বেও দালালদের সাথে যোগাযোগ করে। যখন পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা ভিকটিমদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, তখন অনিয়মিত ও বিশ্বাস-অযোগ্য মানুষরা সেই স্থান নিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ভিকটিমরা তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য দালাল ও চোরাচালানকারীদেরকে ভাড়া করে। কখনো কখনো এমন কাউকে ভাড়া করে, যারা তাদেরকে পাচারের ক্ষেত্রে জড়িত ছিল। এই চোরাচালানকারীদেরকে চাহিদা অনুসারে টাকা দিতে গিয়ে ভিকটিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যার অর্থ হলো ভিকটিমের আবারো পাচারের শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কখনো কখনো এই দালালদের মাধ্যমে ভিকটিমরা নিজেদের বাড়িতে ফিরতে সক্ষম হলেও তারা সনাক্তকরণ ও সহায়তা বলয়ের বাইরেই থেকে যান। .

আচরণগত বাধাসমূহঃ

ভিকটিমরা পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সামনে নিজেকে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে অবিশ্বাস-জনিত বাধা অতিক্রম করে। কম্বোডিয়ার নারীদের অনেকগুলো ঘটনা এমন ছিল যেখানে তারা প্রাথমিকভাবে চীনা পুরুষদেরকে বিয়ে করার জন্য অভিবাসিত হন, কিন্তু পরিস্থিতি তাদের ধারণার চাইতে অনেক বাজে ছিল কারন সেখানে তাদেরকে পাচার করা হয়েছিল। সেসব নারীদের নিজ দেশে পারিবারিক সহিংসতা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল এবং নারীদের স্বাধীনতা কম থাকা এতটা স্বাভাবিক চর্চা হিসাবে ছিল যে নারীরা গুরুতর সহিংসতা না ঘটলে নিজেদেরকে ভিকটিম হিসেবে সনাক্ত করার কথা চিন্তাও করতেন না। একজন ভিকটিম বলেন, "**আমি সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই কারণ আমি আর আমার পরাধীন অবস্থায় বেঁচে থাকা মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করিনি কারণ আমি ভেবেছিলাম আমি নিজের ইচ্ছায় চীনে এসেছি । একারণে আমি একজন নারী প্রতিবেশীর কাছে সাহায্যের জন্য যাই।**"

"বিভিন্ন জাতীয়তার ভিকটিমদের কাছে নিগ্রহের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। বেশিরভাগই আমাদের কাছে আসে তাদের কোনো বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে।" – তাইওয়ানি সম্মুখসারির কর্মী

"ওই সময় আমার কাছে একটি স্মার্টফোন ছিল, এবং আমি আমার স্বামীর বাসার পাশের এক কম্বোডীয় প্রতিবেশীকে আমাকে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে বলি। আমার মায়ের সাথে যুক্ত হবার পর আমি তাকে কোনো একটি এনজিও খুঁজে বের করতে বলি এবং অভিযোগ জমা দিতে বলি" – কম্বোডিয় সারভাইভার

সাইবারস্পেসের মাধ্যমে ভিকটিমরা অবিশ্বাস-জনিত বাধা অতিক্রম করে। কর্তৃপক্ষের এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ যখন সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় থাকে তখন তারা তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষদের সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করে। এই প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষগুলো ফোনে যোগাযোগ করার গতানুগতিক পদ্ধতির চাইতে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রযুক্তির সাথেই অধিক পরিচিত। আমরা জানতে পেরেছি হটলাইনের মত আনুষ্ঠানিক অভিযোগের প্রক্রিয়াও কার্যকর হয় না। ভিকটিমরা সাধারণত এগুলো ব্যবহার করে না, এবং যখন করেও, তখন তারা খুব কমই সনাক্ত হয়।

সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত গতবাধা নিয়মগুলো পাল্টানোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ আচরণগত বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারে। যেসব জনগোষ্ঠীর ভেতর জোরপূর্বক বিবাহ চলমান, সেখানে স্থানীয় পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো ভিকটিমের বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অসহায়ত্বকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং সনাক্ত হবার সুযোগ নষ্ট করে দেয়। যদিও আমরা যে কম্বোডিয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে চীনা পুলিশের মধ্যে জোরপূর্বক বিবাহের শিকার ব্যক্তিদেরকে ভিকটিম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনা ধীরে ধীরে সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে, একইসাথে তাদেরকে উদ্ধার ও সনাক্ত করতে কম্বোডিয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করাও অনেকটা স্বাভাবিক বিষয় হয়েছে।

একজন কম্বোডিয় (দূতাবাস) কর্মকর্তা বলেন, "আমি অনেক বছর আগে যেভাবে কাজ করতাম আর এখন যেভাবে কাজ করি তার মধ্যে পার্থক্য আছে... এখন অনেক এনজিও ও সরকারি কর্মকর্তারা মানবপাচারের ভিকটিমদেরকে সহায়তা প্রদান করছেন। এটি আমাদের জীবন পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ করেছে।"

প্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহঃ

ভুক্তভোগীরা নতুনভাবে গঠিত সহায়তা প্রদানকারী দলের মাধ্যমে বাধাগুলো অতিক্রম করে।
আমরা যেসব ভিকটিমের সাথে কথা বলেছি তাদের আগে থেকেই এমন ধারনা ছিল যে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কিছু নির্দিষ্ট মাত্রার অনানুষ্ঠানিক আচরণ ও শোষণের ঘটনা ঘটতে পারে। অভিবাসী কর্মীদের মাঝে আগে থেকেই সামাজিকভাবে এই ধারনা থাকায় কখন তাদের শোষণের অভিজ্ঞতা পাচারের মধ্যে পড়ে যায় এবং তারা সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপযুক্ত হয়- তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের গবেষণায় অনেক বাংলাদেশি পুরুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমনই ছিল। ভিকটিম সনাক্তকরণে সক্রিয় কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান না থাকায় একটি বিশেষ সংস্থা– দি অনির্বান নেটওয়ার্ক – এগিয়ে আসে এবং ভিকটিমদেরকে দেশব্যাপি কয়েকটি অঞ্চলে সারভাইভারদেরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ছোট ছোট দল তৈরি করতে সাহায্য করে, যেখানে সারভাইভাররা একসময় তাদের কমিউনিটির নেতা হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ বিষয়-নিবেদিত বিভাগ গঠনের মাধ্যমে বাধাসমূহ অতিক্রম করতে পারে। এটা বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ ভিকটিমই পুলিশ বা সীমান্তরক্ষীদের বিশ্বাস করবে না। এক্ষেত্রে বিশেষায়িত টাস্কফোর্স বা কমিটি, যারা ভিকটিমদেরকে বার্তা দেয় যে তারা ভিন্নধরণের সাংগঠনিক স্বার্থের জন্য কাজ করছে- গঠন করা হলে তা ভিকটিমদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

"ভিকটিম সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কারণ আমরা পাচারসংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য একটি মানপাচারবিরোধী এলাকাভিত্তিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছি। তথ্য আদানপ্রদান এবং বাধাসমূহ ও তা থেকে উত্তোরণের কৌশল সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে এই কমিটি নিয়মমাফিক সভা আয়োজন করে থাকে" – কম্বোডিয় কর্মকর্তা

কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে বাধাসমূহ অতিক্রম করে। সম্মুখসারির কর্মীদের জন্য একটি অন্যতম গুরুতর বাধা হচ্ছে কোন অপরাধকে মানবপাচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কী কী তথ্যপ্রমাণ প্রয়োজন সে বিষয়ে অস্পষ্টতা। অন্য যেকোনো অপরাধের সোজাসাপটা সংজ্ঞার চাইতে মানবপাচারের অপরাধ অনেক বেশি জটিল। কম্বোডিয়ার সরকার উপযুক্ত প্রশ্নমালার সমন্বয়ে একটি ফর্ম প্রচলন করেছে যা যথাযথভাবে ভিকটিম সনাক্তকরণে সহায়ক।

"শ্রম মন্ত্রনালয় একটি ফর্মের প্রচলন করেছে যা সরকার ও এনজিওগুলো নির্বিশেষে পাচার নির্ধারণে ব্যবহার করতে পারবে। যেহেতু ফর্মটি মেডিকেল রিপোর্টসহ পাচারসংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য বহন করে, তাই এই ফর্মটি সরাসরি আদালতে পেশযোগ্য " – কম্বোডিয় কর্তৃপক্ষ

পরিশেষ এবং সুপারিশ

উপরে আলোচিত বাধাগুলোর সবগুলোই খুব ভালোভাবে লিপিবদ্ধ এবং একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বাধা, যা ভিকটিমদেরকে বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত ও নিশ্চুপ রাখে। সনাক্তকারী কর্তৃপক্ষও একই ধরণের বাধার মুখোমুখি হয় যা তাদেরও বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত ও উদাসীন করে রাখে। এই বাধাগুলো বৈষম্যমূলক এবং ভঙ্গুর সনাক্তকরন পদ্ধতির মূলে নিবদ্ধ। ভিকটিমরা প্রধানত প্রান্তিক ও সহজে যোগাযোগ করা যায় না- এমন এলাকাগুলোতে বসবাস করে এবং সাধারণত অনানুষ্ঠানিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সনাক্তকারী কর্তৃপক্ষের অফিসগুলো এমন স্থানে হয় যা অবকাঠামোগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভিকটিমের অবস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

তবে যেসব ক্ষেত্রে ভিকটিমরা সফলভাবে সনাক্ত হয়েছেন সেসব ঘটনার গতি-প্রকৃতি বিবেচনা করে কীভাবে আরো দ্রুত তাদের সনাক্তকরণ সম্ভব হবে- এ বিষয়ে আমরা সূক্ষ্ম পর্যালোচনা পেয়েছি। আমরা সনাক্তকরণের ধারণাটির একটি নতুন গঠন পেয়েছি যা সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বের যে অনুমান- "সনাক্তকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কর্তৃপক্ষ ভিকটিমের সাথে সম্পন্ন করে"- তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কার্যকর সনাক্তকরণের জন্য আমাদের ভিকটিম এবং কর্তৃপক্ষকে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করাতে সহায়ক হিসাবে কাজ করতে হবে। ভিকটিম এবং সনাক্তকারী কর্তৃপক্ষকে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা, বিশ্বাস স্থাপন এবং একে অপরের সাথে সংযোগের সুযোগ তেরিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে হয়তো ভিকটিমকে আরো কার্যকরভাবে সহায়তা করতে আইনগুলোকে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে; ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষকে প্রণোদনা দিতে নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে; এবং বৈষম্য, দারিদ্র্যতা ও অন্যান্য কাঠামোগত দুর্বলতা- যা মানবপাচারের ঝুঁকি সৃষ্টি করার মূল কারন হিসাবে কাজ করে- সেগুলো নির্মূল করা সম্ভব হবে। যাইহোক, এই গবেষণায় সফল সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আমরা নিরীক্ষা করে দেখেছি যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদেই করা সম্ভব।

যদিও আমরা এই রিপোর্টে সুসংহত নীতি পরিবর্তন-বিষয়ক সুপারিশ দেয়া হতে একরকম বিরত থেকেছি, তথাপি আমরা কতিপয় 'দ্রুত অর্জনযোগ্য' বিষয়ের পাশাপাশি কিছু 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' সুপারিশ তৈরি করেছি। আমাদের আহ্বান হচ্ছে- সকল পদক্ষেপে অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে থাকা পদ্ধতিগত কাঠামো ও বৈচিত্রতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তা না হলে পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত পদক্ষেপগুলোর অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে।

দ্রুত অর্জনযোগ্য বিষয়
ভিকটিম ও সনাক্তকারী কর্তৃপক্ষের মাঝে অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ তৈরি করা, যেমন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে।
সম্মুখসারির কর্মীদেরকে, যেমন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীদেরকে ভিকটিম সনাক্তকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা
ভিকটিমদের সাথে সম্ভাব্য যোগাযোগ ঘটাতে অতিরিক্ত সংখ্যক নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করা, যেমন জোরপূর্বক বিবাহের শিকার নারীদের সাহায্যে শারীরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা।
অভিবাসীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সহায়তা ও উন্নয়ন জোরদার করা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী
ভিকটিমদেরকে আরো কার্যকরভাবে সহায়তা করতে বিদ্যমান আইনগুলোর পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা। উদাহরণস্বরূপ, আইনে ভিকটিমদেরকে শাস্তি না দেয়ার নীতি অন্তর্ভুক্ত করা। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে "পাচার হওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, অভিযুক্ত করা, কারাগারে পাঠানো, বিচার করা ও দণ্ড দেয়া বা তাদের কোন বে-আইনি আচরণের ফলে - যা তারা পাচারের সরাসরি পরিণতি হিসাবে করেছে- তাদেরকে অন্য কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না " (ICAT, 2020)
ভুক্তভোগী ও কর্তৃপক্ষকে প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত করতে নীতিমালায় পরিবর্তন করা। যদিও বিচারব্যবস্থা মানবপাচারকারীদের বিচার চলাকালে মানবপাচারের সার্ভাইভারদের সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু সারভাইভারদের সাক্ষ্য দেবার জন্য কোন রকম প্রণোদনা দেয়া হয় না। সাক্ষ্য দেয়ার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ, খরচসাপেক্ষ এবং প্রায়শই বিপজ্জনক, কারণ সাক্ষ্যদাতা মামলার আসামীর দ্বারা হুমকির/জবরদস্তির শিকার হন। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা চলাকালে ভিকটিমকে উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে একইসাথে ভিকটিম ও কর্তৃপক্ষকে প্রণোদনা দেয়া সম্ভব। এতে ভিকটিম যেমন সাক্ষ্য দিতে নিরাপদ বোধ করবে, আবার কর্তৃপক্ষের হাতেও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণসহ আমলযোগ্য অভিযোগ থাকবে। এমন আরেকটি সাধারণ কিন্তু কার্যকরী প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে ভার্চুয়াল আদালতে শুনানির সুবিধা বাড়ানো। কোভিড-১৯ মহামারির সময় থেকে এই প্রযুক্তি বহুলব্যবহৃত হওয়ায় বহু দেশ ভার্চুয়াল আদালতে বিচার পরিচালনা চলমান রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেমন, ফিলিপাইনস (OpengovAsia, 2021)। ভিকটিমরা ভার্চুয়ালি সাক্ষ্য দিতে তুলনামূলক বেশি নিরাপদ বোধ করেন।
অন্যান্য আইনের বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যতটা তৎপর ভূমিকা রাখে পাচারবিরোধী আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ততটা ভূমিকা রাখতে তাদেরকে উৎসাহিত ও ক্ষমতায়িত করা। পাচার রোধে উদ্বুদ্ধ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেশাল টাস্কফোর্স এটি অর্জনে সহায়ক হতে পারে। ভিকটিমদেরকে এই টাস্কফোর্সগুলো বার্তা দিতে পারে যে তারা বিশ্বাসযোগ্য। একইসাথে এ ধরনের টাস্কফোর্সগুলো ভিকটিমদেরকে তৎপর হয়ে খুঁজে বের করতে উল্লেখযোগ্য অর্থ, সময়, ও জনবল বরাদ্দ রাখতে পারে। পাচারের ভিকটিমদেরকে 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে গণ্য না করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিতেও এটি কাজ করবে।
সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি জীবন দক্ষতা ও জীবিকা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে ভিকটিম সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। নিজের কমিউনিটিতে উপার্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় অনেক ভিকটিমকে অগত্যা বিপজ্জনক কাজের সুযোগ গ্রহন করতে হয় যা তাদেরকে পুনরায় পাচারের অবস্থায় ফেলতে পারে। সম্ভাব্য ভিকটিমদেরকে এই ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করেও তাদেরকে বিপজ্জনক কাজের বিষয়ে নিবৃত্ত করা যায় না, বিশেষত যখন কোন রকম উপার্জন ছাড়া ঘরে বসে থাকাও তার জন্য অনুকূল বিকল্প নয়। এমন অবস্থা মোকাবেলায় ন্যুনতম ও নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই ব্রিফিংয়ে নিম্নল্লোখিত তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এই তথ্যসূত্রগুলো মূল রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি:

ILO. (2022). 50 million people worldwide in modern slavery. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm

Zorzi, L. (2023). A "New Possible" for Justice after COVID-19: towards Digital, Open and Inclusive Courts. UNDP. Retrieved from: https://www.undp.org/asia-pacific/judicial-integrity/blog/new-possible-justice-after-covid-19-towards-digital-open-and-inclusive-courts

মূল রিপোর্টের গ্রন্থপঞ্জির জন্য অনুগ্রহ করে পূর্ণ রিপোর্টটি দেখুন।